হিংসা ও মানবতার সংকট : তারাশঙ্করের ছোটগল্প

*অনিতা গোস্বামী (যশ)

প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সাহিত্যে হিংসা-বিদ্বেষের প্রকাশ ঘটেছে। কারণ সাহিত্য জীবন নির্ভর। মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, ঘাত-প্রতিঘাত, সার্থকতা-ব্যর্থতার চিত্রই গল্পে উপন্যাসে তথা সাহিত্যে অঙ্কিত হয়ে থাকে। জীবনে চলার পথে মানুষকে নানা চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করতে হয়। আবার মানুষের নিজের মধ্যে চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বও কম নয়। তাছাড়া ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নানা জটিলতা আছে। আরও আছে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ-ধর্ম-রাজনীতির সম্পর্কের দ্বন্দ্ব। মোট কথা, মানবজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত অনিবার্য। আর এই অনিবার্য দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূত্র ধরেই মানবজীবনে ঘটে হিংসা বা বিদ্বেষের ঘটনা। হিংসা বা বিদ্বেষ মানবজীবনে কখনোই কাম্য নয়। কিন্তু কখনও কখনও তা হয়তো শিল্পের বা কাহিনীর প্রয়োজনে শিল্পী চিত্রিত করে থাকেন; আবার কখনও তা জীবনের স্বাভাবিকতা রূপে জীবনকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। হিংসা বা সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে মানুষের ক্রূর-কুটিল রূপটি আমাদের কখনও বিস্মিত বিমূঢ় করে তোলে, কখনও গভীর সত্য উপলব্ধিতে পোঁছে দেয়।

এখন প্রশ্ন হল, মানবজীবনের এই হিংসা বা সংঘর্ষের ঘটনা সাহিত্যিক কীভাবে গ্রহণ করেন এবং সাহিত্যে তা কীভাবে প্রতিফলিত করে থাকেন। সাহিত্যে যে হিংসা-বিদ্বেষের ছবি আমরা দেখে থাকি তার সাহায্যে সাহিত্যিক কাহিনীকে ট্র্যাজেডিতে পোঁছে দেন। আর এই ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে লেখক পাঠককে এক গভীর জীবনবোধে উন্নীত করেন। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে, মানবজীবনে হিংসা বা বিদ্বেষমূলক ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে পাঠককে গভীরতম জীবনসত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। বিশিষ্ট কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি ছোটগল্প পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে মানবজীবনের এই সহিংসতার ঘটনা আমাদের কোন্ গভীরতম জীবনসত্যের সন্ধান দেয় এবং আমাদের শাশ্বত জীবনভাবনাকে কীভাবে বিস্মিত বিমূঢ় করে তোলে ?

রাঢ়ের কথাশিল্পী তারাশঙ্করের সাহিত্যে বিশেষতঃ ছোটগল্পে জীবনের আদিমতা, রুদ্রতা, রুক্ষতার চিত্রাঙ্কনই প্রধান বিষয়।

> "রাঢ়ভূমির মানুষজনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-ব্যর্থতা, জৈব জীবনের কামনা-বাসনার আদিম ছন্দ, তাদের বিচিত্র ধর্ম-পিপাসা-রুচি-চরিত্র-চেহারা-ভাব-ভাষা প্রভৃতি এত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় তারাশঙ্করের গল্পে রূপ নিয়েছে যে, রাঢ় অঞ্চলের সংস্কৃতির এমন সাহিত্যরূপ ইতিপূর্বে আর চোখে পড়েনি।"[১]

তিনি গ্রামের মানুষ; সেই মানুষের আদিম স্বভাব, সেখানকার মাটির গন্ধ, আলো, বাতাস--সব মিলিয়ে গড়ে ওঠা এক সচেতন মানুষকে তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। তাঁর গল্পে

> "কাহিনী আছে, ঘটনা আছে, কিন্তু চরিত্রই লেখকের একমাত্র উদ্দিষ্ট। সেক্ষেত্রে চরিত্র নিহিত জটিল মনস্তত্ত্বটি কাহিনী ও ঘটনার ওপরেই একান্ত নির্ভরশীল হয়। চরিত্র মনের জটিল আলোয় আলোকিত হওয়ার থেকে ঘটনা-তাড়িত হয়ে তার ভাগ্যচিত্রে সফল হয়।" [২]

অর্থাৎ ঘটনা দ্বারা চালিত হয়েই চরিত্র পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। আমরা তারাশঙ্করের কয়েকটি গল্পেও সেইসব ঘটনার দিকেই আলোকপাত করতে চাই যে সকল ঘটনা আমাদের ট্র্যাজেডি ভাবনায় পোঁছে দেয়।

'তারিণী মাঝি' গল্পে তারাশঙ্কর প্রবৃত্তি তাড়িত জীবনের নির্মম নিয়তির ভয়ংকর লীলাকে বিচিত্র ভঙ্গিতে অবলোকন করেছেন। এই গল্পের নায়ক তারিণী খেয়া নৌকোর একজন মাঝি। বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষী নদীর গনুটিয়ার ঘাটে যাত্রী পারাপার করে সে তার জীবন নির্বাহ করে। নিজের জীবনের পরোয়া না করে ময়ূরাক্ষীর জলে ডুবে যাওয়া অসংখ্য মানুষকে সে বাঁচায়। এদিক থেকে আভিধানিক অর্থেই সে ছিল তারিণী অর্থাৎ ত্রাণকর্তা।

তারিণীর কোন সন্তান ছিল না। তার জন্য তারিণীর মনোবেদনার কোন পরিচয় গল্পে পাওয়া যায় না। নিঃসন্তান জীবনে স্ত্রী সুখীই তার একমাত্র আশ্রয়, অবসরের সঙ্গী। তারিণীর স্ত্রী সুখীও ছোট্ট সংসারে স্বামীকে নিয়ে পরিতৃপ্ত। সন্তানহীন দাম্পত্যজীবনে দুজনেই দুজনকে গভীরভাবে ভালবাসত, তাতে কোন খাদ ছিল না।

> "সমস্ত রকম ছোট-বড় সুখ-দুঃখ -বিপদের দিনে তারা পরস্পরের প্রেমে, আকর্ষণে একান্তভাবে আপন হয়ে থাকে।" [৩]

এর পাশাপাশি দেখা যায় ময়ূরাক্ষী ও তারিণী একই জীবনছন্দে দোলায়িত। ময়ূরাক্ষীকে আশ্রয় করেই তারিণী জীবিকার সংস্থান করে। এই নদী গ্রীষ্মে শুষ্ক থাকে, কিন্তু বর্ষায় সে প্রমত্ত রূপ ধারণ করে।

> "অবিশ্রান্ত বর্ষণে, বাতাসের অট্টহাসি ও নদীর গর্জনে আদিম প্রকৃতির ক্রূর কুটিল রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে।"[৪]

ময়ূরাক্ষীর প্রলয়ঙ্কর মূর্তি সাক্ষৎ মৃত্যুর দোসর রূপে গল্পটিতে এক গভীর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। এই নদীর ভয়াবহ বন্যায় সমস্ত গ্রাম ডুবে গেলে তারিণী স্ত্রী সুখীকে পিঠে করে সাঁতার দিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে চেয়েছে। কিন্তু ময়ূরাক্ষীর প্রবল জলের স্রোতে তারিণীর শরীর ক্রমশ আড়ষ্ট হয়ে আসে, তার উপর সুখী তাকে প্রাণভয়ে অক্টোপাসের

মত জড়িয়ে ধরে। জীবনের সুকঠিন পরীক্ষায় একদিকে তারিণীর একমাত্র আপনজন তার স্ত্রী সুখী, অন্যদিকে তার নিজের বাঁচার উদগ্র বাসনা। গল্পকার অসামান্য তীক্ষ্মতায় ও নির্মম নৈপুণ্যে গল্পের পরিণতিটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন—

> "বাতাস--বাতাস! যন্ত্রনায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পরমুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। সে কি তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ! হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বিপুল ভারটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে লইয়া চলিয়াছিল, সেটা খসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। আঃ, আঃ--বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে সে কামনা করিল, আলো ও মাটি।"[৫] (পৃ. ২৭৯)
>
> "বাঁচার তাগিদে--অন্ধ জৈবসত্তার তাগিদে তারিণী সুখীর গলা টিপে ধরে। তাকে মেরেই তারিণী মাঝি আপনাকে বাঁচায়। এখানে জীবধর্মেরই জয়।"[৬]

অথচ এই হত্যা একই সঙ্গে তারিণী এবং পাঠকের কাছে আনাকাঙ্ক্ষিত। তারিণী বন্যার জলে ডুবে যাওয়া মানুষকে উদ্ধার করে আপন প্রাণধর্মের তাগিদে। অথচ নিষ্ঠুর নিয়তির লীলায় সে তার প্রাণপ্রিয় একমাত্র জীবনসঙ্গী সুখীকে গলা টিপে হত্যা করে ফেলে। আসলে মানুষের জীবনে এরকম সংকট মুহূর্ত কখনও কখনও এসে হাজির হয় যখন অতি প্রিয় বস্তুকেও সে নির্দ্বিধায় ত্যাগ করে। এখানে মনুষ্যজীবনের এক নিষ্ঠুর সত্যই গল্পটির উপসংহারে উদ্ভাসিত হয়েছে।

এই গল্পে লেখক আমাদের দেখিয়েছেন যে, স্বাভাবিক প্রাকৃতিক মানুষের জীবন ও ধর্ম পরিবেশ এবং পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেখানে হৃদয়বৃত্তি ও প্রবৃত্তির দুর্বার সংঘাতে কোন্ অদৃশ্য লীলায় শেষ পর্যন্ত প্রবৃত্তি জয়ী হয়ে যায়। হিংসা নয়, প্রবৃত্তিই তাকে প্রতাড়িত করে, হৃদয়বৃত্তি পরাজিত হয়।

এর পাশাপাশি তারাশঙ্করের গল্পে আছে একটা শান্ত জীবন জিজ্ঞাসা। জীবনের প্রচণ্ড ক্ষোভকে শান্তচিত্তে তিনি মেনে নিয়েছেন। জীবন ও তার পরিণাম সম্পর্কে তিনি নির্বিকার। অদ্ভুত এক শেক্সপীরীয় নিরপেক্ষতা তাঁর গল্পে বর্তমান। ঘটনাগত ঘাত-প্রতিঘাতে মানবজীবনের দোদুল্যমানতার ছবি তিনি তাঁর ছোটগল্পে এঁকেছেন। তাঁর রচিত 'বেদেনী' গল্পে আমরা তাঁর নির্বেদ মানসিকতার পরিচয় পাই।

'বেদেনী' গল্পটিকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে দেহবাদের গল্প। গল্পের নায়িকা রাধা বেদে পরিবারের সন্তান। তার প্রাণলীলা কোন সংস্কার ও মূল্যবোধকে মানে না। তার সর্বাঙ্গে একটা মাদকতা, যৌন লালসা তার প্রবল। শিথিল মুক্ত স্বাধীন জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি পাবার জন্যে সে একের পর এক স্বামী ত্যাগ করে অন্য স্বামী গ্রহণ করে। ব্যক্তিগত

সুখের জন্যে নায়িকা রাধা পূর্বতন স্বামীকে অবলীলায় দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে বা তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এক আগ্রাসী রূপের চিত্র এই গল্পে পাওয়া যায়; যেখানে মানুষ পণ্যরূপে ব্যবহৃত।

কঙ্কালীর মেলায় খেলা দেখাতে আসা বাজিকর শম্ভু ও তার সঙ্গিনী রাধিকাকে নিয়ে এই গল্প। চৌদ্দ বছর বয়সে শিবপদর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রাধিকার। জাতে বেদে হলেও শিবপদর শান্ত কোমল স্বভাব এবং তার শৌখিনতা কিশোরী রাধাকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু শিবপদর যেখানে সীমাবদ্ধতা, তা হল তার উদ্দামতার অভাব। সেজন্য তার প্রতি এক ধরনের করুণা বা ভালো লাগা থাকলেও উচ্ছলতা ও চঞ্চলতার অভাবে তার প্রতি ক্রমশ রাধার ঘৃণা জন্মে। তাই সতেরো বছরের যুবতী রাধা উদ্ধত দৃষ্টি ও চওড়া কাঁধের মানুষ শম্ভুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিবপদকে ত্যাগ করে।

> "উগ্র পিঙ্গাল বর্ণ, উদ্ধত দৃষ্টি, কঠোর বলিষ্ঠ দেহ পুরুষ জয় করে নিল রাধিকাকে।"[৭]

বিয়ের তিন বছরের মধ্যে রাধার মনে শিবপদর প্রতি এই ঘৃণা জন্মানোর অন্যতম কারণ বোধ হয় তার চাকচিক্যহীন একঘেয়ে পান্‌সে জীবন, যে জীবনে রামধনুর বর্ণালি নেই।

শম্ভুর প্রতি রাধা আকৃষ্ট হয় নিশ্চয়ই শিবপদর সঙ্গে তার গুণগত পার্থক্য তুলনা করে। এই তুলনার উৎস শম্ভুর উদ্দামতা ও তার বাজিকর জীবনের বহিরঙ্গের জৌলুষ। আকর্ষণহীনতা একদিকে, অন্যদিকে আকর্ষণীয়তা। শম্ভুর সঙ্গে রাধার দাম্পত্য জীবন পাঁচ বছরের।

> "রাধিকা বেদেনী শিবপদকে ত্যাগ করে শম্ভু বাজীকরের সান্নিধ্যে এসে উঠেছিল, আবার সবল সুন্দর বলিষ্ঠপুরুষ কিষ্টো তাকে আকৃষ্ট করলে সে শম্ভুর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতায় দ্বিধাবোধ করেনি।"[৮]

কেষ্টর বলিষ্ঠ, উদ্দাম, আরও বর্ণময় জীবন যখন রাধাকে আকৃষ্ট করে তখন সে যে কারণে শিবপদকে ত্যাগ করে শম্ভুকে গ্রহণ করেছিল, ঠিক ঐ একই কারণে শম্ভুকে ত্যাগ করে কেষ্টকে গ্রহণ করে। এর থেকে মনে হতেই পারে এটা রাধা চরিত্রের স্বভাব। একদিন হয়তো কেষ্টকে ত্যাগ করে অন্য কোন তরুণকে সে গ্রহণ করবে।

এখানে আমরা রাধার এই স্বভাবকে কীভাবে বিশ্লেষণ করব? ভালোবাসা থেকে বিরাগ এবং তা থেকে ঘৃণা ও শেষ পর্যন্ত তা থেকে আক্রোশ —- এটা আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য। বিশ শতকে ব্যক্তি চরিত্র ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তির আবেগ ছাড়াও তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটুকু দেখা দরকার। এই গল্পের নায়িকা আধুনিক নারী। আধুনিকতার এক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রাধা ততক্ষণ পর্যন্ত শিবপদর সঙ্গে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি তার ভালোবাসা থাকবে। যখন ভালোবাসা থাকবে না তখন তাকে ত্যাগ করবে, প্রয়োজনে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতেও কুণ্ঠিত হবে না। একটি মেয়ে তার ভালোলাগা

মন্দলাগা অনুযায়ী জীবনকে গড়ে তুলতে চায়। ভালো না লাগলে তাকে সে জোর করে ধরে রাখে না। এই জীবন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাধিকার জীবনের পঙ্কিলতার বা অন্ধকারের কোন ছবি আমরা দেখতে পাই না। গল্পকার পরম শ্রদ্ধায় চরিত্রটিকে অঙ্কন করেছেন---

> "সে যেন মদিরার সমুদ্রে সদ্য স্নান করিয়া উঠিল; মাদকতা তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।"[৯]

এখানে রাধিকার স্বভাবের মধ্যে একদিকে রয়েছে তার সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য। তার এই স্বভাব শুধু তার একার নয়, সমস্ত বেদে জাতের মেয়েদের স্বভাব। সুতরাং এদিক থেকে সে নিন্দনীয় নয়। অন্যদিকে বলা যায় রাধিকার এই স্বভাব আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের যে কোন মানুষের আত্ম প্রতিষ্ঠার স্বভাব।

> রাধিকা অসামান্য সুন্দরী---"মহুয়া ফুলের গন্ধ যেমন নিঃশ্বাসে ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও চোখে তেমনই একটা ধরাইয়া দেয় নেশা।"[১০]

এই রূপই তার মূলধন। তার এই আকর্ষণীয় রূপে আকৃষ্ট যে পতঙ্গাকে নিয়ে সে ঘর করবে তাকেই সে পুড়িয়ে মারবে। তাই দেখি যতক্ষণ পর্যন্ত তার শিবপদকে ভালো লাগে ততক্ষণ পর্যন্তই সে তার সঙ্গে থাকে। যখন তাকে ভালো লাগে না তখন তাকে ধ্বংস করে চলে যায় শম্ভুর কাছে---

> "কি যে হইয়াছিল রাধিকার, এক বিন্দু আপত্তি পর্যন্ত করে নাই। দিন কয়েক পরেই সে শিবপদর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইয়া শম্ভুর তাবুঁতে উঠিয়াছিল। শিবপদর চোখের জলে বুক ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু রাধিকার মমতা হওয়া দূরের কথা, লজ্জা হওয়া দূরে থাক, ঘৃণায় বীতরাগে তাহার অন্তর রি-রি করিয়া উঠিয়াছিল। রাধিকার মা-বাপ, গ্রামের সকলে তাহাকে ছি-ছি করিয়াছিল, কিন্তু রাধিকা সে গ্রাহ্যই করে নাই।" [১১] আবার এই শম্ভুর প্রতি যখন আকর্ষণ হারায় তখনও কেষ্টর কাছে চলে যায় শম্ভুকে পুড়িয়ে দিয়ে--- "চলিতে গিয়া রাধিকা থামিল, বলিল, দাঁড়াও। সে কেরাসিনের টিনটা শম্ভুর তাঁবুর উপর ঢালিয়া দিয়া মাঠের ঘাসের উপর ছড়া দিয়া চলিতে চলিতে বলিল, চল। টিনটা শেষ হইতেই সে দেশলাই জ্বালিয়া কেরাসিনসিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল,--- মরুক বুড়া পুড়্যা।"[১২]

উজ্জ্বল জীবনের টানে রাধিকা একের পর এক স্বামী ত্যাগ করতে, এমন কি স্বামীকে পুড়িয়ে মারতেও দ্বিধান্বিত হয় না।

তাহলে আমরা রাধার মধ্যে কী পেলাম? একদিকে পাই বেদে জাতের স্বভাব বৈশিষ্ট্য, যেটা আমাদের মনে হয় গল্পের বাইরের দিক। অন্যদিকে গল্পের ভিতরে রয়েছে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নির্মম ছবিটি। ধনতান্ত্রিক সমাজের মূল মন্ত্র বলা যায়- 'Survival of the fittest.' অর্থাৎ যারা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে তারাই পাবে বাঁচার অধিকার। যারা অযোগ্য তাদের বাঁচার অধিকার নেই। চতুর্দশ শতকের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রাধা প্রাণচঞ্চল উদ্দাম কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হলেও সময় ও সমাজের অনুশাসনের নিগড়ে বাঁধা পড়ে বিবাহিত ক্লীব স্বামী আইহনের ঘর করতে বাধ্য হয়েছিল। তারাশঙ্করের রাধিকার মত ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল না বলেই বড়ুর রাধার মন 'কুম্ভারের পণী'র মত পুড়ে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণালও অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়েছে ঠিকই, কিন্তু নিজের কোন উন্নত ভবিষৎ জীবন সে গড়তে পারেনি। কিন্তু এই গল্পের রাধা একটা পূর্ণতার দিকে, উৎকর্ষতার দিকে যাত্রা করেছে। সে মনে করে এটা তার অধিকার। রাধিকার জীবনের পঙ্কিলতাকে দেখানো যে এখানে লেখকের উদ্দেশ্য নয় তা বোঝা যায় গল্পের এবং চরিত্রের নামকরণ থেকেও। একটি মেয়ের জীবনের স্থূল কামনা-বাসনা বা স্বৈরিণী হিসেবে তাকে দেখানো লেখকের উদ্দেশ্য নয়, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাঁর লক্ষ্যের দিক থেকে গল্পটিকে দেখলে তা উপলব্ধি করা যায়।

প্রতিযোগিতার বাজারে অনেক কষ্ট করে শম্ভুকে মেলায় পয়সা রোজগার করতে হয়। তার এই অর্থনৈতিক সংকটের ছবি গল্পে বার বার এসেছে। এই অর্থনীতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা পুঁজিবাদী সভ্যতার এক বিশেষ দিক। রাধিকার মত উন্নতিকামী, উচ্চাভিলাসী নারীকে শম্ভুর বর্তমান অনুজ্জ্বল জীবনের পাশে কেষ্টর চাকচিক্যময় জীবন বার বার আকৃষ্ট করে। অর্থসর্বস্ব ধনতান্ত্রিক সমাজে সংস্কার, মূল্যবোধ, মানবিকতার প্রশ্ন প্রায় অবান্তর হয়ে গেছে। রাধিকাও যেখানে শ্রেষ্ঠ হয়ে বাঁচতে পারবে সেখানেই সে চলে যায়। এখানে তার কোন সংস্কার, মূল্যবোধ বা মনুষ্যত্বের পরিচয় আমরা পাই না। ক্রমাগত শ্রেষ্ঠত্বের আকাঙ্ক্ষাই এখানে রাধিকার মধ্যে ফুঠে উঠেছে যা ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির এক বৈশিষ্ট্য। নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার দিকেই সে এগিয়ে যায়। সেখানে কে বেদেনী, কে স্বৈরিণী, কে পাপিনী সে প্রশ্ন ওঠে না। একটা বিশেষ সত্তার পরিচয়ই সেখানে বড় হয়ে ওঠে। জীবনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রয়োজনেই সে একের পর এক, দুই—চার--ছয় পুরুষকে গ্রহণ ও বর্জন করে। উজ্জ্বল জীবনের আকর্ষণেই সে যে কোন পুরুষকে শিবপদ বা কেষ্টর মত অবলীলায় পরিত্যাগ করতে পারে বা পুড়িয়ে মারতে পারে। এজন্য তার কোন দ্বিধা বা সংকোচ নেই। আধুনিক ভোগবাদী জীবনের প্রতিচ্ছবি 'বেদেনী' গল্পের ক্যানভাসে চিত্রিত হয়েছে। যেখানে হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ মানুষের চেতনাকে আলোড়িত করতে পারে না।

শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে একটি যুগান্তকারী সৃষ্টি হল তারাশঙ্করের 'ডাইনী'।

> ''ডাইনী' গল্পটিতে অভিশপ্তা সমাজ জীবন চ্যুত একটি নারীর চিত্র অতি দরদ দিয়ে তারাশঙ্কর রচনা করেছেন।''[১৩]

তারাশঙ্কর তাঁর ছোট বেলায় নিজের গ্রামে দেখা ডাইনী অভিধায় ভূষিত একটি মেয়েকে দেখেই এই গল্পটি লিখেছিলেন। গল্পটিতে আমরা সামাজিক প্রথার এক বর্বর রূপকে প্রত্যক্ষ করি। ভারতবর্ষের অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে অন্ত্যজ শ্রেণীর দরিদ্র অনাথা বৃদ্ধা মহিলাদের ডাইনী সন্দেহে পিটিয়ে মারার বীভৎস ঘটনা আজও ঘটে চলেছে। মিথ্যে সন্দেহ, সংশয় ও কুসংস্কারের বাস্তব অভিজ্ঞতা নির্ভর কাহিনী হল 'ডাইনী'। সুরধুনী নামে গ্রামের একটি দরিদ্র নিম্নবর্ণের মেয়ের জীবনের করুণ ট্র্যাজেডি ফুটে উঠেছে গল্পটির মধ্যে। সামাজিক অশিক্ষা, কুসংস্কার, মূঢ়তা এবং ধর্মান্ধতার কারণে সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক মানসিকতার অধিকারী নিষ্পাপ পবিত্র স্বভাবের একটি মেয়ে শুধুমাত্র দৈহিক রূপে একটু অস্বাভাবিকতা থাকার জন্য কীভাবে সমাজের এক নিষ্ঠুর বর্বর প্রথার বলি হয়ে নারী থেকে ডাইনীতে পরিণত হয় লেখক গল্পটির মধ্যে তাই দেখাতে চেয়েছেন। একটি মেয়ের ব্যক্তিগত দুঃখ এবং বিপর্যয়ের কাহিনী হল 'ডাইনী' গল্পটি। নারী জীবনের অস্তিত্বের অসহায়তাই গল্পটির মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে।

সুরধুনীর পঞ্চাশ বছরের জীবনকথা গল্পে বর্ণিত হয়েছে। সে এখন যাট বছরের এক বৃদ্ধা। কিন্তু এখন সে আর সুরধুনী নামের একটি স্বাভাবিক মানবী নয়, একটি অতিপ্রাকৃত সত্তা -- ডাইনী। আজ চল্লিশ বছর ধরে সে এক অভিশপ্ত জীবন যাপন করছে লোকালয় বর্জিত ছাতিফাটার মাঠের একটি প্রান্তে একখানি কুঁড়ে ঘরের মধ্যে মিথ্যা ডাইনী আখ্যা নিয়ে—

> ''সেই আমবাগানে আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে এক ডাকিনী--ভীষণ শক্তিশালিনী নিষ্ঠুর ক্রূর একটা বৃদ্ধা ডাকিনী।''[১৪]

চল্লিশ বছর আগেকার কতকগুলি কাকতালীয় ঘটনা তার এই দুর্ভাগ্যের কারণ।

গ্রামের সাধারণ একটি মেয়ে, নাম সুরধুনী। কিন্তু মেয়েটি দেখতে কুৎসিত, চোখ ও চুল একটু কটা। নারী সুলভ সমস্ত স্বাভাবিক বৃত্তিই তার ছিল, বিয়েও হয়েছিল তার। স্বামীকে সে খুবই ভালোবাসত, মায়া-মমতা সমস্তই ছিল তার। কিন্তু অভিশপ্ত জীবন তার, তাই সমস্ত আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু ঘটে। মাত্র দশ-এগারো বৎসর বয়সে মা-বাবা মারা যাবার পর তার কুৎসিত রূপের জন্য সকলে তাকে ঘৃণা করতে থাকে। শুরু হয় তার উপর প্রচণ্ড পীড়ন।

"একা, নিঃসঙ্গ এই জীবনে সে সদা কুড়োয় মানুষের অবজ্ঞা, ঘৃণা, ভয়, তাচ্ছিল্য। তার চোখে নাকি সর্বনাশী লোলুপ শক্তি যা দিয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে অবলীলায়।"[১৫]

কতকগুলো ঘটনা ঘটে যায় স্বাভাবিকভাবে। সে যখন পিতৃ-মাতৃহীন দশ-এগারো বছরের অপাপবিদ্ধ একটি বালিকা তখন ক্ষুধার্ত হয়ে একদিন গ্রামের হারু চৌধুরীর বাড়িতে ভিক্ষা করতে যায়। ঐ সময় তাদের ছেলেটি খেতে বসেছিল। কিছুক্ষণ পরে কোন কারণে ছেলেটির পেটে ব্যথা শুরু হয়। তারা ভেবে নেয় মেয়েটি লোভ দেওয়ার কারণেই তাদের ছেলের পেট ব্যথা হয় এবং তাকে ডাইনী অপবাদ দিয়ে মেরে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়।

"যে কোন মানুষের খাওয়ার সময় বাইরের কোন লোভী মানুষের নজর পড়লে তার ক্ষতি হয়, খাদ্য সহ্য না, মারা যায়--"[১৬]

এই অন্ধ লোকবিশ্বাসটি ঐ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ঐ গ্রামে বসবাসকারী ঐ মেয়েটিরও ছিল বলেই গ্রামের লোকের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিও ভাবতে শুরু করে যে সে তাহলে ডাইনীই। এরপরই একদিন কোন গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা করতে গিয়ে বড় মাছ ভাজার গন্ধে তার রসনায় জল আসায় তার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হয়। অথচ ভিক্ষা চাওয়ার সময় মাছ ভাজার গন্ধে তার মত অনাথ, অভাবী, ক্ষুধার্ত একটি মেয়ের মুখে লালা দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ডাইনী মানসিকতা থেকেই সে এটাকে অন্যায় বলে ভেবে নেয়। ইতিমধ্যে একদিন তারই সমবয়সী স্বজাতীয়া সাবিত্রীর বাড়িতে সে যাওয়ার পর সাবিত্রীর সদ্যোজাত সন্তানটি কাকতালীয় ভাবে অসুস্থ হয়ে মারা যায়। গ্রামের লোক তখন সুরধুনীকেই তার মৃত্যুর কারণ ভেবে নেয়। গ্রাম-গ্রামান্তরে সর্বত্র সে কথা প্রচারিত হয়ে গেলে সকলের কাছেই সে ভীষণ আতঙ্কের বিষয় হয়ে ওঠে। ফলে নিজের গ্রামে মেয়েটির আর জায়গা হয় না। গ্রাম ছেড়ে সে পালিয়ে যায়। ঐ একই কুসংস্কারের মধ্যে বেড়ে ওঠার ফলে মেয়েটিও বিশ্বাস করে নেয় সে তাহলে সত্যি সত্যিই ডাইনী। মুখের থুতু বারবার মাটিতে ফেলে দেখতে থাকে তার মধ্যে রক্ত আছে কিনা। ঠাকুরের কাছে মানত করে তিনি যেন তাকে ডাইনী থেকে মানুষ করে দেন। নিজের গ্রাম ছেড়ে বোলপুরে এসে আশ্রয় নেবার পর একটি পতিত ডোম জাতির ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। ছেলেটি কাজ করত একটা কলে। স্বামীকে সে খুবই ভালোবাসত। কিন্তু ভাগ্যের এমন নির্মম পরিহাস কিছুদিন পর তার স্বামী হঠাৎ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। মেয়েটি তখন ভেবে নেয় তার স্বামীর এই অকাল মৃত্যুর জন্য তার ডাইনী দৃষ্টিই দায়ী এবং এ কথা সে একজনকে বলেও ফেলে। ফলে তার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার মানুষজনও তার ডাইনী স্বভাবের জন্যই এমনটা হয়েছে বলে বিশ্বাস করে নেয়। তখন ঐ গ্রামেও তার আর স্থান হয় না।

ONLINE ISSN 2278-5264
Volume-I, Issue-II, October-2012
© Department of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India

এরপরই লাঞ্ছিতা সুরধুনী গিয়ে আশ্রয় নেয় লোকালয় থেকে বহুদূরে অবস্থিত জনমানব বর্জিত ভয়ংকর রুক্ষ অনুর্বর অভিশপ্ত ছাতিফাটার মাঠের একপ্রান্তে। কিন্তু সেখানেও ভাগ্য তার পিছু ছাড়ে না। একদিন গ্রীষ্মকালে একটি মেয়ে তার ছোট্ট বাচ্চাটিকে নিয়ে পথ হারিয়ে জলের সন্ধানে তার কুঁড়েঘরে হাজির হয়। কিন্তু তাকে দেখেই সে ভয়ে বিশ্রাম না নিয়ে বা জল না খেয়ে ছেলেটিকে নিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ফলে অতিরিক্ত সূর্যের তাপে কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটির মৃত্যু হলে লোকে তাকেই দোষ দেয়। একদিন এক বাউরী যুবক তাকে দেখে ভয়ে অন্ধকারে ছুটে পালিয়ে যাওয়ার সময় যুবকটির পায়ে রাস্তায় পড়ে থাকা হাড়ের টুকরো ঢুকে গেলে সারা গ্রামে বিশ্বাস জন্মায় যে ডাইনী তাকে বাণ মেরেছে—

> "অতি তীক্ষ্ম একখানা হাড়ের টুকরা সে মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতেই সেটা আসিয়া তাহার পায়ে গভীর হইয়া বসিয়া গিয়াছে।"[১৭]

এই সমস্ত ঘটনাই কার্যকারণ সম্বন্ধহীন। কিন্তু গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত লোক সুরধুনীকেই তার জন্য দায়ী করেছে। সকলের কাছ থেকে একই কথা শুনতে শুনতে

> "শেষে সে নিজেও বিশ্বাস করতে শুরু করে সে ডাইনী।"[১৮]

শ্রীহীনতার জন্য নিজেকেই সে দোষী ভাবতে থাকে—

> "অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল -— নরুণ দিয়া চেরা, ছুরির মত চোখে, বিজলীর মত এই দৃষ্টিতে যাহাকে তাহার ভালো লাগে তাহার আর রক্ষা থাকে না।"[১৯]

ফলে অপরাধবোধে ভুগতে থাকে সে। কী নিদারুণ অসহনীয় তার এই মানসিক বেদনা।

ডাইনী সম্পর্কে কুসংস্কার ঐ অঞ্চলের লোকের ছিল, মেয়েটি ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ায় তারও ঐ সংস্কার ছিল। ফলে মেয়েটির জীবনে দেখা দিল চরম বিড়ম্বনা-—সকলের কথায় সেও নিজেকে ডাইনী ভেবে নিল। এটাই তার জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের কারণ। তার ট্র্যাজেডির চরমতা সেখানেই -— যেখানে সে নিজেকে একজন স্বাভাবিক মানবী বলে বিশ্বাস করতে পারল না। মুখের থুতু বারবার মাটিতে ফেলে দেখতে চাইল তাতে রক্ত আছে কিনা। গলায় আঙুল ঢুকিয়ে বারবার জোর করে বমি করার ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রথম দিকে বমির সঙ্গে অল্প অল্প রক্তের ছিটা এবং শেষে বেশ খানিকটা তাজা রক্ত বেরিয়ে আসে। আর তখনই সে তার ডাইনী সত্তা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে যায়। তাই গভীর রাতে তারাদেবীর মন্দিরে গিয়ে মানত করে —

> "মা, আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করিয়া দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দেব।"[২০]

দশ বছর ধরে আক্রমণে বিধ্বস্ত হতে হতে সুরধুনী ডাইনীতে পর্যবসিত হয়। নিজের গ্রামে তার স্থান না হওয়ায় নিরাশ্রয় অনাথ মেয়েটি আশ্রয় নেয় অন্যত্র। সেখানেও তার জায়গা না হওয়ায় সে চলে আসে ছাতিফাটার মাঠে।এই দীর্ঘ মাঠটি পার হতে গিয়ে প্রাচীনকালে কেউ জলের অভাবে ছাতি ফেটে মারা যাওয়ার পর থেকেই মাঠটির এই নামকরণ। ভয়ঙ্কর এই জায়গার বাসিন্দা সে এখন। একজন স্বাভাবিক মানবী তার যাবতীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে এক অস্বাভাবিক সত্তায় পরিণত হয়ে যায়। সংঘবন্ধ সামাজিক Violence একটি স্বাভাবিক মেয়েকে এই ভাবে নারী থেকে ডাইনীতে পরিণত করে। গল্পের শেষে দেখা যায় প্রচণ্ড কালবৈশাখীর ঝড়ে একদিন খৈরী গাছের ডালের ছুঁচালো ডগা বিদ্ধ হয়ে ঘটে তার শোচনীয় বীভৎস মৃত্যু। কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীর অহরহ নির্যাতন তাকে শেষপর্যন্ত মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। একটি অভিশপ্ত মানবীর বেদনাকে গল্পকার অনাসক্ত মহিমায় উদ্ভাসিত করেছেন। এই গল্পে

> "ডাইনীঅপবাদে ভূষিতা 'মানহারা মানবীদের' প্রতি মানবদরদী শিল্পী তারাশঙ্করের আন্তরিক সহানুভূতি ও দরদের পরিচয় পাওয়া যায়।"[২১]

চলমান জীবনের চলচ্চিত্রের পর্দা ওঠালে আমরা মানব জীবনের হিংসার (Violence) আরও বহুবিধ রূপের পরিচয় পাব। কিন্তু আমার নিবন্ধের স্বল্প পরিসরে জীবনের রুদ্র রূপের রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি গল্প অবলম্বনে ব্যক্তিগত জীবনে হিংসার প্রভাব কীরূপ তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। প্রথম গল্পে আমরা দেখলাম, নিয়তি-তাড়িত মানুষ কীভাবে কঠিন পরিস্থিতিতে অনাকাঙ্ক্ষিত হিংসায় জড়িয়ে গিয়ে নিজেকে বিমূঢ় করে তোলে ও পাঠককে এক কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। না চাইলেও তারিণী তার স্ত্রীকে হত্যা করতে বাধ্য হয়; অথচ এখানে অন্য কিছু ঘটা সম্ভবও নয়। এই হিংসার ঘটনা আমাদের প্রত্যয়কে দুমড়ে মুচড়ে অসহায় করে তোলে না কি? দ্বিতীয় গল্পে আধুনিক ধনতান্ত্রিক ভোগবাদী সমাজব্যবস্থার ভয়ঙ্কর রূপটি ধরা পড়েছে। যেখানে মানুষ তার ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাসের জন্য রাধিকার মত যে কোন হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠতে পারে। তার কাছে পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ, মানবতা-সহমর্মিতার কোনো মূল্য নেই; ব্যক্তিগত সুখের জন্য সে যে কোনো ক্রূর-নিষ্ঠুর কাজ করতেও পিছপা হয় না। সে কোনো নৈতিকতা বা মূল্যবোধের ধার ধারে না। তাই এই গল্পে ব্যক্তিগত হিংসা আমাদের শাশ্বত জীবন ভাবনাকে ব্যথিত করে তোলে। মানবতাবোধের এই সংকট আমাদের রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেখানে তিনি এই আধুনিক সভ্যতার সংকটের দিনেও মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখার কথা বলতে পারেন। তৃতীয় গল্পে সংঘবন্ধ সামাজিক হিংসার প্রতিরূপ দেখে পাঠক হৃদয় শিহরিত হয় এবং সামাজিক কুসংস্কার ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে নতুন করে লড়াই করার ভাবনা জাগায়। আজও পরিকল্পনাহীন রাষ্ট্রব্যবস্থার কারণে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ফলে গ্রাম্য জীবনে দলবদ্ধভাবে মানুষ

নির্মমভাবে এক অসহায় নারীকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এখানেও মানুষের এই হিংসোন্মত্ত রূপ দেখে আমাদের হৃদয় হতাশাগ্রস্ত হয় এবং চিত্ত পীড়িত হয়। কিন্তু এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী ? আমাদের এখনও বহুদূর পথ চলতে হবে। মানবসভ্যতা বার বার সংকটের সম্মুখীন হয়েছে; কিন্তু তার পরেও সব বাধা-বিপত্তি সরিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে। হিংসা জীবনেরই একটা অংশ, যাকে আমরা পুরোপুরি পরাভূত করতে পারব কিনা জানি না। কিন্তু তারপরও মানব সমাজকে বলব--চরৈবেতি, চরৈবেতি।

সূত্রনির্দেশ :

১। তারাশঙ্কর : সময় ও সমাজ-- আদিত্য মুখোপাধ্যায়, পাণ্ডুলিপি সং ১৯৯৩, পৃঃ ১০৩

২। বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ--বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ০৯, ১৯৯৫, পৃঃ ১৯৯

৩। তদেব পৃঃ ২০৯

৪। তারাশঙ্কর অন্বেষা--সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, রমা প্রকাশনী, কলিকাতা-০৫,১৯৮৭, পৃঃ ২০৯

৫। তদেব পৃঃ ২০৯

৬। কালের পুত্তলিকা--ড. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ-ডি.এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা-০৬, পৃঃ ৩১৬

৭। তদেব, পৃঃ ৩১৮

৮। তারাশঙ্করের শিল্পিমানস--ড. নিতাই বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-৭৩, ১৯৮৮, পৃঃ ১৭৭

৯। বাংলা গল্প সংকলন (২য় খণ্ড)--সংকলন ও সম্পাদনা--অশ্রুকুমার সিকদার, কবিতা সিংহ, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৭, পৃঃ ৫৮

১০। তদেব, পৃঃ ৫৮

১১। তদেব, পৃঃ ৬১

১২। তদেব, পৃঃ ৬৬

১৩। তারাশঙ্কর রচনাবলী (৭ম খণ্ড)--মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স প্রা. লি., কলিকাতা-৭৩,১৩৮৯, সম্পাদক : শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রী সুমথনাথ ঘোষ, শ্রী সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৯৯

১৪। তদেব, পৃঃ ৪৭৬

১৫ । বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ--বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ০৯, ১৯৯৫,পৃঃ ২১৭

১৬ । তদেব, পৃঃ ২১৭

১৭ । তারাশঙ্কর রচনাবলী (৭ম খণ্ড)--মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স প্রা. লি., কলিকাতা-৭৩,১৩৮৯, সম্পাদক : শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রী সুমথনাথ ঘোষ, শ্রী সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৮৮

১৮ । কালের পুত্তলিকা--ড. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ--ডি.এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা-০৬, পৃঃ ৩২২

১৯ । তারাশঙ্কর রচনাবলী (৭ম খণ্ড)--মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স প্রা. লি., কলিকাতা-৭৩,১৩৮৯, সম্পাদক : শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রী সুমথনাথ ঘোষ, শ্রী সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৭৭

২০ । তদেব, পৃঃ ৪৮২

২১ । তদেব, পৃঃ ৫০২

গ্রন্থঋণ :

১ । তারাশঙ্কর রচনাবলী (৭ম খণ্ড)--মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স প্রা. লি., কলিকাতা-৭৩,১৩৮৯, সম্পাদক : শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রী সুমথনাথ ঘোষ, শ্রী সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২ । বাংলার ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ--বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ০৯, ১৯৯৫

৩ । তারাশঙ্কর অন্বেষা--সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, রমা প্রকাশনী, কলিকাতা-০৫, ১৯৮৭

৪ । বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা--ড. বিজিত ঘোষ, পুনশ্চ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-২০০০

অনিতা গোস্বামী (যশ), সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ,করিমগঞ্জ কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম, ৭৮৮৭১০